DEPT –POLITICAL SCIENCE

POL-H-CC-T- 3 (SEM-2ND)

UNIT- 3

সপ্তম অধ্যায়

ধর্ম ও ভারতীয় রাজনীতি
(Religion and Indian Politics)

এটি অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে ধর্ম সমাজে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করে আবার ধর্মই বিভেদ ও দাঙ্গার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অধ্যাপক M.V. Pylee বলেছেন, "It is a paradox that while almost every religion stands for and preaches the unviersal brotherhood of man, religion has been a constant source of conflict in human history." ভারতের মতো বহু ধর্মাবলম্বী দেশে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য কারণ এখানে ব্রিটিশ শাসকগণ নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে 'বিভেদ ও শাসন নীতি' (Divide and Rule Polity)-র দ্বারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন।

পাইলি বলেছেন ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলেও এবং একটি ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের জন্ম হলেও সেই সময় ভারতবর্ষে প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন মুসলমান, দশ মিলিয়ন খ্রিস্টান, পাঁচ মিলিয়ন শিখ এবং একটি বেশ বড়ো সংখ্যার পার্সি, জৈন, বৌদ্ধ ও ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষ থেকে গিয়েছিলেন। তাই সেই অবস্থায় ভারতকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র রূপে ঘোষণা না করলে গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়ত; পাইলির ভাষায়, "democracy in India might have become a label without meaning, a form without substance."

Donald Eugene Smith তাঁর *India as a Secular State* গ্রন্থে বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ব্যক্তি, সংঘ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি থাকে, কেননা ওই রাষ্ট্র প্রতিটি ব্যক্তিকে ধর্মনিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবেই দেখে, সাংবিধানিক দিক থেকে রাষ্ট্র কোনো বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত থাকে না এবং কোনো ধর্মমতকে সমর্থন করে না, অথবা ধর্মের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না। স্মিথের দেওয়া এই সংজ্ঞাটি ইউরোপ ও আমেরিকায় ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজমের প্রচলিত সংজ্ঞা।

স্মিথের সংজ্ঞাটিতে সেক্যুলারিজমের তিনটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। প্রথমটি, ধর্মের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক; দ্বিতীয়টি, ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক; এবং তৃতীয়টি, রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক। প্রথমটি, ব্যক্তির পছন্দমতো ধর্মাচরণের স্বাধীনতার অর্থাৎ ধর্মের 'ইতিবাচক স্বাধীনতা'র কথা, রাষ্ট্র এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। দ্বিতীয়টি, 'ধর্মের নেতিবাচক স্বাধীনতা'র কথা, যার অর্থ, ধর্মের কারণে কোনোরকম বাধানিষেধ আরোপ করা, পক্ষপাতিত্ব করা অথবা কাউকে কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। তৃতীয়টি, ধর্মের 'নিরপেক্ষ স্বাধীনতা'র কথা; রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকবে না, সব ধর্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি হবে নিরপেক্ষ।

পশ্চিমি দেশগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ করা হয়েছে রাষ্ট্র ও রাজনীতির সঙ্গে মতাদর্শ হিসাবে ধর্মের অর্থাৎ ধর্মের সামাজিক ভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে। Thomas Jefferson ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বুঝিয়েছেন এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে থাকবে "a wall of separation between Church and State." Oxford English Dictionary-তে 'Secularism'-এর সংজ্ঞা হল "the principle of sepration of the state from religious institutions." কিন্তু ধর্ম শুধু মতাদর্শই নয়, ধর্ম ব্যক্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে পালনীয় বিশ্বাসও। ভারতের মতো বহু ধর্মের দেশে, যেখানে ব্যক্তিগত আচরণে ধর্মের প্রভাব ব্যাপক, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ আলাদা। ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ করা হয়েছে— সব ধর্মকে এবং সংস্কৃতিকে সমান সম্মান দেখানো হবে এবং রাষ্ট্র বা সরকার কোনো একটি ধর্মের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখাবে না, সব ধর্মকে সমান সুযোগ সুবিধা দেবে।

ভারতের সংবিধান বিশারদ শ্রী দুর্গাদাস বসু তাঁর *ভারতের সংবিধান পরিচয়* গ্রন্থে বলেছেন যে সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের' আদর্শ সন্নিবিষ্ট করে বহু ধর্মের দেশ ভারতের জনগণের মধ্যে ঐক্য আর সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া হয়েছে। 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' অর্থাৎ রাষ্ট্র সকল ধর্মকে সমানভাবে রক্ষা করবে এবং কোনো ধর্মকেই রাষ্ট্র ধর্ম (State Religion) হিসাবে স্বীকার করবে না। ১৯৭৬ সালের সংবিধান (৪২তম সংশোধন) আইনে সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি সন্নিবেশিত করে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষকতার আদর্শ এখন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। আমাদের সংবিধানে কোনো ধর্মকেই 'established church' অর্থাৎ 'সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও পৃষ্ঠপোষক' ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করার ব্যবস্থা নেই। প্রস্তাবনায় 'বিশ্বাস, ধর্ম আর উপাসনা' ('belief, faith and worship')-র ক্ষেত্রে স্বাধীনতার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা কার্যকর করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ২৫ থেকে ২৯-এ সকল নাগরিককে ধর্মের স্বাধীনতা সংক্রান্ত মৌলিক অধিকার প্রদান করে। এই অনুচ্ছেদগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্ম বিশ্বাসের,

ধর্ম পালনের ও ধর্ম প্রচারের ("right to profess, practice and propagate religion") স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়েছে। শ্রী দুর্গাদাস বসুর মতে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মতো প্রতিবেশী দেশগুলিতে যেখানে কোনো বিশেষ একটি ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে ভারতীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের এ এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

শশী থারুর (Shashi Taroor) তাঁর *Why I Am A Hindu* (২০১৮) শীর্ষক একটি সাম্প্রতিক বইতে বলেছেন, "Secularism in India did not mean irreligiousness" অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মহীনতা বোঝায় না। Osmania University-র অধ্যাপক Kancha Ilaiah তাঁর *Buffalo Nationalism* (২০১৮) পুস্তকে একটি মাত্র ধর্ম বা বিশ্বাসকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টাকে 'spiritual fascism' বা ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ বলে চিহ্নিত করেছেন।

অধ্যাপক বিপান চন্দ্র, অধ্যাপক খ্রিস্টোফে জেফ্রেলট (Christophe Jaffrelot), অধ্যাপক মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অরুণাভ ঘোষ, ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ, উপাচার্য ড. সুরঞ্জন দাস প্রমুখ পণ্ডিতদের অনুসরণ করে আমরা ধর্ম ও রাজনীতির জটিল সম্পর্কটির বিভিন্ন দিক তুলে ধরার চেষ্টা করব। বর্তমান ভারতে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে যুগপৎ বিরোধিতা এবং সমঝোতার এক জটিল বহুমাত্রিক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে। রামানুজ গাঙ্গুলি ও সৈয়দ আবদুল হাফিজ মইনুদ্দিন তাঁদের *সমকালীন ভারতীয় সমাজ* গ্রন্থে আক্ষেপ করেছেন যে সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন ফ্যাসিস্ট মানসিকতা দেখা দিচ্ছে। সম্প্রদায় অনেক প্রকারের। তবে ভারতে সাম্প্রদায়িকতা মূলত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা। এই সাম্প্রদায়িতকার পিছনে আছে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, নিজধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা। সাম্প্রদায়িকতার বিপদ, সাম্প্রদায়িক বিভাজন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি কথার মধ্য দিয়ে মূলত প্রধান দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়— হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ এবং তার থেকে উদ্ভূত সমস্যাকে বোঝানো হয়। 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' কথাটিও প্রধানত ব্যবহৃত হয় সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়কে বোঝাতে, যদিও ভারতে খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই পর্যায়ভুক্ত।

ইংরেজদের আগমনের পূর্বে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ ছিল না। তাদের মধ্যে ছোটো খাটো যে সব বিরোধ ছিল তা কখনো সাম্প্রদায়িক রূপ পায়নি। ধর্মীয় সহাবস্থানের দেশ ভারতে ধর্মীয় বিভেদের বীজ বপন করার ক্ষেত্রে ইংরেজদের আগ্রহ ছিল সহজবোধ্য। ভারতের মতো বিশাল দেশে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তারা সুচতুরভাবে ভারতের প্রধান দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলানোর যে কৌশল গ্রহণ করেছিল (Divide and rule) তা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত নয়। ১৮৬২ সালে লর্ড এলগিনকে লেখা একটি চিঠিতে

লিগের পালটা হিসেবে লালা লাজপৎ রায়ের উদ্যোগে হিন্দু মহাসভা গঠিত হয় ১৯২৫ সালে। গান্ধীজির সঙ্গে বিরোধের ফলে ১৯২০ সালে মহম্মদ আলি জিন্না কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লিগে যোগদান করেন এবং লিগের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ইতিমধ্যেই মোর্লে-মিন্টো সংস্কারের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থায় মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক ভোট ও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩০ সালে মুসলিম লিগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে কবি ইকবাল বলেন, "পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বালুচিস্তান মিলে একটি রাষ্ট্র আমি দেখতে চাই।" তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের জন্য একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যের কথা বলেন। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেসের জয়লাভ মুসলমান জাতীয়তাবাদী ধারাটিকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। পৃথক রাষ্ট্রের দাবির সমর্থনে ধর্ম ছাড়াও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের পার্থক্যকে গুরুত্ব দিয়ে 'দ্বিজাতি তত্ত্বে'র যুক্তি খাড়া করা হয়। জিন্নার প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪০ সালের লাহোরের অধিবেশনে মুসলিম লিগ প্রথম সরকারিভাবে 'পাকিস্তান' গঠনের দাবি জানায়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গঠনের মধ্য দিয়ে ভারতকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভাজনের ব্রিটিশ পরিকল্পনা সফল হয়। কিন্তু তার ফলে স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা কমেনি। কারণ ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠনের পরও পাকিস্তানে বসবাসকারী মুসলমানের চেয়ে ভারতে বসবাসকারী মুসলমানের সংখ্যা বেশি এবং হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে তার সুযোগ নিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সদা তৎপর।

জনগণের মধ্যে মেরুকরণ, বিদ্বেষপূর্ণ পরিবেশ, অস্ত্রশস্ত্রের সহজলভ্যতা, পুলিশ ও জন-প্রশাসনের অপ্রতুলতা, গণমাধ্যমে বিকৃত তথ্য পরিবেশন ইত্যাদি সাম্প্রদায়িকতার কারণ।

ভারতীয় বহুত্বের বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন ধর্ম, জাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের লোক ঐতিহাসিক ভাবে এই মহাদেশে বসবাস করছে যা এক 'composite culture' বা 'syncretism'-এর জন্ম দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি গজেন্দ্র গদকার সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ করা হয়েছে এইভাবে— "রাষ্ট্রের কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি আনুগত্য নেই, রাষ্ট্র ধর্মহীন বা ধর্মবিরোধীও নয়; রাষ্ট্র সব ধর্মকে সমান স্বাধীনতা দেয়।" সাম্প্রদায়িকতা সবচেয়ে বেশি সাহায্য ও পুষ্টি পায় রাজনীতি থেকে। প্রয়োজন আমাদের মধ্যে সমন্বয়মূলক চেতনার বিকাশ।

ভারতের মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় লক্ষ্য হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা ছিল না। ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংশোধনীতে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি যোগ করা হয়েছে। ৪২তম সংশোধনীর আগে শুধুমাত্র সংবিধানের ২৫(২) ধারাতে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। ২৫ ধারাতে প্রত্যেককে নিজের বিবেক বুদ্ধি অনুসারে ধর্মাচরণের স্বাধীনতার

১১। ৩০ (১) এবং (২) ধারা। এই দুটি ধারায় সংখ্যালঘু ধর্মীয় বা ভাষাগোষ্ঠীকে নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি ও পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে সরকার আর্থিক অনুদান প্রভৃতির ক্ষেত্রে কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব করতে পারবে না।

বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে Hardgrave ও Kochanek বলেছেন যে বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হল "Mandal, Mandir and Market"। ২০০৫ সালে প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থা পর্যালোচনার জন্য দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী রাজিন্দের সাচার (Rajinder Sachar)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। সাচার কমিটি (Sachar Committee) বলেন "the status of Muslims in India is abysmal." কমিটি বলেন যদিও মুসলমানরা ভারতের জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ তথাপি সরকারি আমলাতন্ত্রে মুসলিম কর্মীর সংখ্যা মাত্র ২.৫ শতাংশ। কমিটি 'mainstreaming of minorities' বা সংখ্যালঘুদের জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার কথা বলেন ও একটি Equal Opportunity Committee গঠনের প্রস্তাব দেন—যার কাজ হবে বৈষম্যের অভিযোগগুলির নিষ্পত্তি করা।

বিভাজনের রাজনীতি (politics of polarization) ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ফলে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা সংকটের মুখে। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন এর পিছনে তিনটি বিভিন্ন অথচ পরস্পর সম্পৃক্ত প্রবণতাকে লক্ষ করেছেন— (১) সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদ; (২) সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ; এবং (৩) জঙ্গি রক্ষণশীলতা। ফ্যাসিবাদ বলতে তিনি উল্লেখ করেছেন, উগ্র হিন্দুত্বের রাজনীতি সামগ্রিকভাবে ফ্যাসিবাদী নয়, কিন্তু এর সঙ্গে ফ্যাসিবাদী রাজনীতির কিছু কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য হিংসা ও অস্ত্রের ব্যবহার, একটি সম্প্রদায়কে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে আঘাত হানা, বিভেদমূলক আবেগজনিত উন্মাদনা ও জনসমাবেশ এবং নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অসাংবিধানিক বাহুবল প্রয়োগ হল সেই মিল। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বলতে তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদের কথা বলেছেন, যা শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে। ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধী রাজনীতির মূলে তৃতীয় প্রবণতা বলে তিনি উল্লেখ করেছেন জঙ্গি রক্ষণশীলতাকে। এর অর্থ, সাধারণ মানুষের কুসংস্কারের প্রতি যুক্তিহীন আকর্ষণকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার। তাঁর মতে, ভারতের বিশাল হিন্দু জনসমষ্টিকে হিন্দুধর্মের সংকীর্ণ ব্যাখ্যার প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিকৃত বর্ণনার মাধ্যমে। অধ্যাপক সেন তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন এইসব প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা বলে।

শিক্ষাক্ষেত্রে, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে, গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে বসার ক্ষেত্রে আপেক্ষিক বঞ্চনা বা বঞ্চনার ধারণা সম্প্রদায়গত ভেদাভেদের জন্ম দেয়, যার থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জমি প্রস্তুত হয়। শিক্ষিত, যোগ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ যদি বঞ্চিত হন, তাহলে তাঁরা নিজেদের জাতীয় মূলস্রোতের বাইরে বলে মনে করতে পারেন। নিজেদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বলে ভাবতে পারেন। তাঁদের ক্ষোভ, অসন্তোষ সম্প্রদায়গত বিভাজনকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিতে ইন্ধন জোগাতে পারে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মানসিকতা— ক্ষোভ, সন্দেহ, অবিশ্বাস, ভীতিকে সঠিকভাবে বুঝে তাদের মনে আস্থার ভাব জাগিয়ে তুলতে হবে। পশ্চাদপদতা দূর করার জন্য তাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশিষ্ট মার্কিন লেখক Ted Gurr তাঁর *Why Men Rebel* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে হতাশা ও বঞ্চনা তীব্র অসন্তোষ ও পরে হিংসার জন্ম দেয়। এটি 'frustration-aggression hypothesis' নামে সুবিদিত।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেন তাঁর *Identity and Violence* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন আমরা বহুত্ব সংস্কৃতিবাদ বা multiculturalism-এর গর্ব করি না কেন আসলে বাস্তবে যেটা দেখা যায় সেটা হল 'plural monoculturalism'। একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে তিনি বলেছেন গভীর নিশীথে মহাসমুদ্রে পাশাপাশি দুটি জাহাজ যখন একে অপরকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় তখন সহাবস্থান হয় ঠিকই কিন্তু ভাবের আদানপ্রদান হয় না। 'Plural monoculturalism' হল ঠিক সেই রকম; আমরা পাশাপাশি হয়তো থাকি কিন্তু মনের মিল হয় না— অধ্যাপক সেনের ভাষায় ঠিক যেন "ships passing by night"।

অধ্যাপক আশুতোষ ভার্সনে (Ashutosh Varshney) তাঁর *Ethnic Conflict and Civic Life* বইতে প্রায় একই কথা বলেছেন। তাঁর মতে যেসকল স্থানে 'civic engagements' বা সামাজিক ও পৌর যোগাযোগ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বেশি সেসকল স্থানে দাঙ্গা হয় না কিন্তু যেখানে 'exclusiveness' বা একান্তে বিচ্ছিন্নভাবে থাকাটা প্রচলিত সেখানেই গণ্ডগোল বাধে।

অধ্যাপক অরুণাভ ঘোষের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরা বলতে পারি যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইকে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় বা সরকারি স্তরে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের বিভিন্ন স্তরে সেই লড়াইকে ছড়িয়ে দিতে হবে। সংখ্যালঘু মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ, তাদের নিরাপত্তা প্রদান শুধুমাত্র সরকারি নীতির দ্বারা, সরকারি পদক্ষেপের মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে মানসিকতার পরিবর্তন, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরি। তার জন্য প্রাথমিক স্তর থেকেই যুক্তিবাদী, মানবিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। নিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদক্ষেপের পরিবর্তে দুর্বল সরকারি নীতি এবং তোষামোদী মনোভাব সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অন্যায় দাবিকে অগ্রাহ্য করার সাহস এবং সংবেদনশীল মন নিয়ে পশ্চাৎপদতার মোকাবিলা— এই দুইয়েরই প্রয়োজন। ইংরেজরা

২০০২ সালে গুজরাটের গোধ্রার ঘটনা এবং তার পরবর্তী হিংসা, সরকার
সাম্প্রদায়িক হানাহানির নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। সংবিধানের
যাই হোক না কেন, সরকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে
করেন। সাম্প্রতিককালে গোরক্ষকদের তাণ্ডব, মন্দির-মসজিদ বিতর্ক, ধর্মীয়
রাজনৈতিক বাতাবরণকে বিষাক্ত করে তুলেছে।

খ্রিস্টোফে জেফ্রেলট (Christophe Jaffrelot) তাঁর *The Hindu Nationalist Movement in India* বইতে দেখিয়েছেন কীভাবে বিজেপি নির্বাচনী স্বার্থে কখনো নরমপন্থা (moderation) আবার কখনো বা জঙ্গি মনোভাব (militancy) নিয়েছে।

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন লিখেছেন যে এই ভাগ্য নির্ণায়ক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে
আমাদের সমাজ মাগহীন হয়ে পড়েছে, তবুও আমাদের পূর্বপুরুষদের ধ্বনির সঙ্গে
ধ্বনিও শোনা দরকার। কোনো প্রথা সব কালে সব মানুষদের জন্য লাভজনক হতে
না। যদি আমরা অতীতের নিয়মগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকি তাহলে আমাদের
মৃতপ্রায় হয়ে পড়বে। পুনরায় প্রাচীনত্বকে ফিরিয়ে আনা নয় বরং অতীতকে ভিত্তি
নবীনের আবাহন করতে হবে। আমাদের ইতিহাস থেকে কিছু শিখতে হবে এবং
এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অতীতকে স্মরণে রেখে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পরিবর্তনগুলির
উদারবাদী দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করা দরকার। ড. রাধাকৃষ্ণন বলেছেন যে প্রত্যেক সমাজ
ইতিহাসে এমন একটা সময় আসে যখন ওই সমাজ একটি সঞ্জীবনী শক্তি রূপে নিজে
অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং প্রগতি অব্যাহত রাখে, সামাজিক ব্যবস্থাগুলিতে কিছু পরিবর্তন
আনা প্রয়োজন। যদি এইসব করতে সে সমাজ অসমর্থ হয় বা তার শক্তি ফুরিয়ে যায়
তাহলে সে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে দূরে সরে থাকে। আমাদের নিষ্প্রাণ কাষ্ঠকে
নিস্তেজ অতীতকে ফেলে দিতে হবে। জড়তা ও অন্ধবিশ্বাসেরে বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১। গাঙ্গুলি, রামানুজ এবং সৈয়দ আবদুল হাফিজ মইনুদ্দিন, *সমকালীন ভারতীয় সমাজ*।
২। Jaffrelot, Christophe, *The Hindu Nationalist Movement in India*, Part I and II.
৩। Chandra, Bipan, *Communalism in Modern India*.
৪। বসু, দুর্গাদাস, *ভারতের সংবিধান পরিচয়*।
৫। Smith, Donald, *India as a Secular State*.
৬। Pylee, M.V., *India's Constitution*.
৭। Singh, M.P. and Rekha Saxena, *Indian Politics*.
৮। Ilaiah, Kancha, *Buffalo Nationalism: A Critique of Spiritual Fascism* (2018).
৯। Tharoor, Shashi, *Why I Am A Hindu* (2018).

ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকীকরণ করেছিল বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। স্বাধীন ভারতেও ইতিহাসের পুনর্লিখন সাধনের প্রচেষ্টা হয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস যুক্তিবাদী, নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে পড়াতে হবে। মন্দির ধ্বংস, মসজিদ আক্রমণের ঘটনার চেয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবসায়িক সহযোগিতা, সম্প্রীতির ঘটনাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করতে হবে। ভারতের সংস্কৃতি যে বিভিন্ন ধর্মের অবদানে সমৃদ্ধ মিশ্র সংস্কৃতি, সেদিকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেহবে।

সাম্প্রদায়িকতা ও তার প্রেক্ষিতে দাঙ্গা, কারণ ও পরিণতি— ইত্যাদি বিষয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে সাম্প্রদায়িকতা থেকে উত্তরণের পথ। দরকার শুধু আমাদের সদিচ্ছার। যে কোনো ধরনের ধর্মীয় তোষণ বন্ধ করা। এক্ষেত্রে রাজনীতি ও ধর্মের পৃথকীকরণ আবশ্যিক।

সাম্প্রদায়িকতার অর্থ এবং তার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র (Bipan Chandra) তাঁর *Communalism in Modern India* পুস্তকে দেখিয়েছেন যে, সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশা, আকাঙ্ক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, মানসিকতা ও দৃষ্টিকোণ এবং তাদের অর্থনৈতিক নিশ্চলতা ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য উদ্যমের অভাবই এর মূল কারণ। ভারতবর্ষে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আজও অসম উন্নয়ন ও বণ্টন দেখতে পাই। সম্প্রদায়ভিত্তিক স্বার্থসমূহের সুরক্ষার নাম করে সম্প্রদায়গত রাজনৈতিক নেতৃবর্গ তাদের ভোটের চাকা সচল রাখতে সাম্প্রদায়িকতার উসকানি দিয়ে থাকে।

দেশের বুকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষটিকে রোপণ করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের দায়ী করা হলেও কেন স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭০ বছর পরেও সেটিকে সমূলে উৎপাটিত করা যায়নি তার জন্য কিন্তু স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝেমাঝেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। ভাগলপুর, কানপুর, মিরাট, মোরাদাবাদ, মুম্বাই প্রভৃতি শহরের নাম জড়িয়ে পড়ে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার সঙ্গে। বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার সময়মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেবার ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে সরকার ঘটনা সম্পর্কে আগে থেকে সতর্ক না থাকার ফলে অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়েছে এবং সরকার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। দাঙ্গাসৃষ্টিকারী দল বা সংগঠনগুলিকে কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারেও সরকারি দুর্বলতা লক্ষ করা গেছে। সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে যে বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং কোনো কোনো রাজ্য সরকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ করার চেয়ে পূর্বসূরি ব্রিটিশদের মতো তার থেকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করতে বেশি আগ্রহী ছিল। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর দিল্লি এবং তার আশেপাশে সংঘটিত শিখ নিধন যজ্ঞ, ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদের ধ্বংস সাধন এবং তৎপরবর্তী দাঙ্গা, ভারতে সাম্প্রদায়িক হানাহানির বড়ো উদাহরণ।

কথা বলা হয়েছে। ২৫(২) ধারাতে বলা হয়েছে ধর্মাচরণের স্বাধীনতার অর্থ এই নয়। তার সঙ্গে যুক্ত অর্থনৈতিক, আর্থিক, রাজনৈতিক অথবা অন্য কোনো ধর্মনিরপেক্ষ কার্যকলাপকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। ৪২তম সংশোধনীতে সংযোজিত ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কী তা কোথাও বলা হয়নি। তবে, সংবিধানের বিভিন্ন ব্যবস্থা থেকে এটা স্পষ্ট যে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ বলে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে: (১) ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা পুরোহিততন্ত্র নয়; (২) রাষ্ট্রের নিজের কোনো ধর্ম নেই; (৩) রাষ্ট্রের চোখে সব ধর্ম সমান; এবং (৪) ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে কোনোরকম ভেদাভেদ করবে না।

সংবিধানের যেসব ধারায় ধর্মনিরপেক্ষতার ইঙ্গিত আছে সেগুলি—

১। ১৪ ধারা। এই ধারায় বলা হয়েছে আইনের চোখে সমান অধিকার এবং আইনের সমান সুরক্ষা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না।

২। ১৫(১) ধারা। এই ধারায় আছে রাষ্ট্র কাউকে ধর্ম, জাতপাত, লিঙ্গ, জন্মস্থান প্রভৃতির কারণে আলাদা করে দেখবে না।

৩। ১৫(২) ধারা। এই ধারায় বলা হয়েছে ধর্ম ইত্যাদির কারণে কাউকে হোটেল, রেস্টুরেন্ট, প্রমোদগৃহ প্রভৃতি স্থানে প্রবেশে এবং পুকুর, স্নানের ঘাট প্রভৃতির ব্যবহারে বাধা দেওয়া যাবে না।

৪। ১৬ ধারা। সরকারের অধীনে চাকরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ধর্ম, জাতপাত ইত্যাদির কারণে কোনোরকম বৈষম্য করা যাবে না।

৫। ১৭ ধারা। এই ধারায় অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৬। ২৫ ধারা। এই ধারাটি বিবেকের স্বাধীনতার ধারা। এতে বলা হয়েছে প্রতিটি ব্যক্তি সমানভাবে নিজের বিবেক অনুসারে স্বাধীনভাবে ধর্ম গ্রহণ, ধর্মাচরণ এবং ধর্ম প্রচার করার অধিকার ভোগ করবে।

৭। ২৬ ধারা। এই ধারায় বলা হয়েছে, সব ধর্মই (ক) ধর্মীয় অথবা দাতব্য প্রতিষ্ঠান তৈরি ও পরিচালনা করতে পারবে; (খ) ধর্ম সম্পর্কিত কাজকর্ম করতে পারবে; (গ) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কিনতে ও রাখতে এবং আইন অনুসারে সেগুলি কাজে লাগাতে পারবে।

৮। ২৭ ধারা। এই ধারায় কোনো ধর্মের জন্য কর আদায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৯। ২৮ ধারা। এই ধারায় সরকারের সাহায্যে পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১০। ২৯(২) ধারা। এই ধারায় বলা হয়েছে সরকারি অর্থে পরিচালিত অথবা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ম, জাতপাত, ভাষা প্রভৃতির জন্য কোনো নাগরিকের প্রবেশাধিকারে বাধা দেওয়া যাবে না।

সাম্প্রদায়িতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে ভুল করে এবং তাকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মনে করে। অর্থাৎ সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতা আর জাতীয়তাবাদ সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

অধ্যাপক আশিস নন্দী (Ashis Nandi) মনে করেন, ভারতীয় সমাজে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ (Cultural nationalism) এবং জাতীয়তাবাদী ধর্মনিরপেক্ষতা (Nationalist Secularism) দুটি ধারণাই ভ্রান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় সমাজে আরোপিত মর্যাদা বা ascriptive status-এর গুরুত্ব বেশি বলে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ। এই কারণে সম্প্রদায়গুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে যে সংস্কারগত অনমনীয়তা ও জড়তা আছে, ধর্মনিরপেক্ষতা তা দূর করতে পারেনি। অতি রাজনীতিকরণ ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ক্রিয়াকলাপ ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমাজের সর্বস্তরে সমানভাবে প্রতিষ্ঠা পেতে দেয় না।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা ভারতের ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িকতার রঙে রাঙিয়েছিলেন। ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীন ও মধ্যযুগকে 'হিন্দু' ও 'মুসলিম' যুগ বলে অভিহিত করা জাতীয় ইতিহাসকেও তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার রং দিতে চেয়েছিলেন। জমিদার ও কৃষকের মধ্যে শ্রেণিসংগ্রামকে হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকের লড়াই বলে চিহ্নিত করে তাঁরা তাতেও সাম্প্রদায়িকতার রং লাগিয়েছিলেন। মোর্লে-মিন্টো সংস্কারের (১৯০৯) মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর (Separate electorate) ব্যবস্থা করে বিদেশি শাসকরা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনকে স্থায়ী রূপ দিতে চেয়েছিলেন। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের দেওয়া 'সাম্প্রদায়িক উপহার' (Communal award) লক্ষ্যও ছিল একই। ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে বুঝতে পেরে ব্রিটিশরা ভারতকে স্থায়ীভাবে দ্বিখণ্ডিত করার ব্যবস্থা করে যায় যাতে দু'দেশের মধ্যে উত্তেজনা বজায় থাকে, যাতে মাঝে মাঝেই যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যাতে এই দুই উন্নয়নশীল দেশ সামাজিক উন্নয়নের চেয়ে সামরিক প্রস্তুতিতে বেশি মনোযোগী হয় এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পথ প্রশস্ত হয়। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান গঠনের মাধ্যমে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও উত্তেজনাকে স্থায়ী রূপ দেওয়া হয় এবং দূর থেকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ যাতে সহজ হয় সেই ব্যবস্থা করা হয়।

ঔপনিবেশিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাসের দিকে তাকালে ব্রিটিশ সরকারের তরফে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির প্রথম প্রচেষ্টা চোখে পড়ে। ১৯০৫ সালে যখন লর্ড কার্জন বঙ্গদেশের হিন্দুপ্রধান পশ্চিম অংশ এবং মুসলমানপ্রধান পূর্ব অংশকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব শলিমুল্লা খানের সভাপতিত্বে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই বছরই আগা খাঁনের নেতৃত্বে ভাইসরয়ের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য 'পৃথক নির্বাচনক্ষেত্র' দাবি করা হয়। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে মুসলিম লিগ স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। মুসলিম

সেক্রেটারি অফ স্টেট উড লিখেছিলেন, "ভারতে (জনগণের) একটি অংশকে অপরের বিরুদ্ধে খেলিয়ে আমাদের ক্ষমতা ধরে রেখেছি এবং আমাদের এটা করে যেতে হবে। সকল ভারতীয়র চিন্তাভাবনা যাতে একই খাতে প্রবাহিত না হয় তার জন্য চেষ্টা করুন।" এই চিঠি থেকেই ভারতে ইংরেজদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এই পরিকল্পনারই অঙ্গ হিসাবে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা পরিকল্পিতভাবেই বিভাজনের নীতি শুরু করেছিল। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ঘোষিত হলেও বাস্তবে কিন্তু ভারতে সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে বারংবার ব্যর্থ হয়েছে। প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং সাম্প্রদায়িকতা রোধে অনীহার পাশাপাশি এ বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়। নির্বাচনী সাফল্য অর্জনের জন্য সর্বভারতীয় এবং আঞ্চলিক দলগুলি প্রায়শই 'সাম্প্রদায়িক তাস' খেলে থাকে। একদিকে যেমন ভারতীয় জনতা পার্টি সরাসরি ভারতে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে, পাশাপাশি কিছু ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ দলের কার্যকলাপও সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগ এবং অন্ধ বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে হয় তা যেমন ভারতীয় জনতা পার্টি দেখিয়েছে, তেমনি মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করে নির্বাচনে জয়লাভ করতে চেষ্টা করেছে। ১৯৮৬ সালের বিতর্কিত বাবরি মসজিদের তালা খোলার নির্দেশদান, অযোধ্যায় রামের পূজার আয়োজন এবং 'মুসলিম মহিলা আইন' প্রণয়নের মাধ্যমে কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃত্ব হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল নির্বাচনী কৌশল হিসেবেই। আর 'রথ যাত্রা' বা 'গৌরব যাত্রা' আয়োজনের পিছনে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বা ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রচারের ভাবনা কাজ করে না তা বলাই বাহুল্য।

শুধু রাজনৈতিক দলগুলি নয়, বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের কার্যকলাপ ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজার রাখার পথে বাধাস্বরূপ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, বজরং দল, 'জামাত-ই-ইসলামী', 'বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি'র মতো উগ্র সংগঠনগুলি সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির কাজে সতত ব্যাপৃত। একদিকে যেমন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মতো সংগঠনগুলি হিন্দুত্ব এবং হিন্দু রাষ্ট্রের স্লোগান তুলে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের পৃথক করে রাখতে, তাদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে সচেষ্ট, তেমনি অপরদিকে 'জামাত-ই-ইসলামী', 'অল ইন্ডিয়া বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি' সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িক বীজ বপন করে ভারতের জাতীয় ঐক্য, সংহতি এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে বিপন্ন করে তুলছে। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতার মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতাও একইভাবে নিন্দনীয়। কিন্তু তুলনামূলক সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতা বেশি বিপজ্জনক কারণ সাধারণ মানুষ ওই